হবার কারণে তিনটি শিশু সন্তানকে অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের রেশন থেকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন এক এএসআই (দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ১লা সেপ্টেম্বর ২০২১)। (গ) শৈলকুপা উপজেলায় পুলিশের পক্ষ থেকে সাপুড়েদের সাথে মতবিনিময় সভায় অপচিকিৎসা না দেওয়ার আহ্বান দেওয়া হয়েছে (দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ১লা সেপ্টেম্বর ২০২১)। (ঘ) খবরটির হেডিং ছিলো– 'পুলিশ সুপারের সহায়তায় সেলিম মিয়ার নতুন জীবন'। সেখানে পুলিশ সুপার প্রথমে মানসিক ভারসাম্যহীন দরিদ্র সেলিম মিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরে স্ত্রী-সন্তান পোষার জন্য মুদি দোকান করে দেন। (দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর ২০২১)

এরই পাশাপাশি, (ক) মুক্তিপণের টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়া সিআইডির এএসপিকে কারাগারে করা হয়েছে প্রেরণ (দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ২৬ আগস্ট ২০২১)। (খ) ঢাকা মহানগরের গোয়েন্দা পুলিশের গুলশান বিভাগে এডিসি হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তাকে ট্রান্সফার ও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে (দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ৯ আগস্ট ২০২১)। এখন কথা হলো ঘটনা দুটিতে কে দোষী আর কে অদোষী, সেটা তো নির্ধারিত হবে বিজ্ঞ আদালতে। কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক তদন্তের পর বোঝা যাবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। কিন্তু খবর তো বেরিয়ে গেছে। এর ফলে জনমতের যে প্রতিক্রিয়া সেটা ঠেকানো যাবে কিভাবে? প্রসঙ্গক্রমে অনেক আগের, ১৯৯৫ সালের ২৫ শে আগস্ট দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার কথাটা স্মরণ করুন। তখন যে জনরোষের সৃষ্টি হয়েছিল, তার তুলনা বোধ করি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উপরের এই ঘটনাগুলিকে কীর্তি অথবা কুকীর্তি যাই বলুন, আমি বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চাই। আসলে মানুষের সমাজটা তো একটা টোটাল ব্যাপার। ব্যক্তিমানুষ তো সেখানে কাজ করে নাটবল্টুর মতো। বিচ্ছিন্নভাবে কাউকে কাউকে প্রশংসা করা যেতে পারে, আবার কাউকে দোষী। সবসময়ই মানবিকতার যে উদাহরণগুলো পাওয়া যায়, তা সামষ্টিক গড় বলে তাকে গ্রহণ করা যায় কি? আবার দুষ্কার্য যা ঘটে, তা তো রোগ নয় রোগের উপসর্গ। সমাজটা যদি পচতে থাকে, তখন এই উপসর্গগুলো বড় হয়ে দেখা দেয়। সেখানে ব্যক্তিমানুষও নিমজ্জিত হতে থাকে। পুলিশও বোধ করি তার ব্যতিক্রম নয়।

এখন আমাদের সমাজটাতে আমরা কী দেখছি? নৈতিকতার শাসনকে বিবেচনা করা যায় মূল উপাদান হিসেবে। কিন্তু সে সমাজ শৃঙ্খলাও যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে– নৈতিক অনুশাসনেরও হচ্ছে অবক্ষয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষিত সুবিধাবাদী শ্রেণীর যে বিস্তার ঘটছে, তা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর। ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিক শিক্ষাকে দেওয়া হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। কিন্তু তা যেন কেবল মুখস্ত করা বুলি হয়ে থাকছে পেটের ভেতর। বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো প্রয়োগ নেই। দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে নেই– রেটিং বেশ ওপরেই। এই সমাজের ওপর স্তরে যারা আছে তাদের দ্বারা একটা ভোগবাদী সমাজ গড়ে উঠছে। বস্তুসর্বস্বতাই যার নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাস্তাঘাট-দালানকোঠা-বিলাসবহুলতা, এগুলো তো বহিরঙ্গীয় প্রদর্শনী। এর ভেতরে আমরা মানুষের আত্মাকে কী করে ধরব? আত্মার প্রসারণই বা কিভাবে ঘটবে? মানবিক মূল্যবোধেরই বা কিভাবে পরিচর্যা হবে? আত্মার যদি শুদ্ধি না হয়, তাহলে কি এগুলো সম্ভব? সেজন্য সমাজমানসের যে সদর্থক গঠন, মৌলিক দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেখানে।

কাজেই আমার মনে হয় শুধু পুলিশ কেন, কাউকেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। দেহের অন্যান্য অঙ্গকে পরিচর্যা না করে যদি কেবল মুখটাকে সাজিয়ে রাখা হয়, সেটা কোন কাজের কথা নয়। এ কারণে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। এজন্য প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির এই শিক্ষাটা সমাজ প্রবাহের ধারায় কি করে একাকার করে দেওয়া যায়, সেটাই বোধ হয় হওয়া উচিৎ মূল লক্ষ্য। জীবনযাপনের সাথে তাকে যাতে অঙ্গাঙ্গী করে তোলা যায়।

বিহাস
০৭/০৯/২০২১

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

(দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পারিমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্প)

প্রকল্পের অবস্থান: পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের রূপুর গ্রাম।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী: ১৯৬৬ সালে ২৬০ একর জমি অধিগ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। নানা কারণে দীর্ঘ সময় প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকার পর ২০১১ সালের ২রা নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্তে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ২রা অক্টোবর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। ২টি রিয়েক্টর থেকে ১২০০+১২০০=২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। প্রথম রিয়েক্টর থেকে ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৭টি দেশের ৪৫৮৮ জন নাগরিক প্রকল্পটিতে কর্মরত রয়েছেন। প্রকল্পটিতে বাংলাদেশী কাজ করছেন প্রায় ৪০ হাজার।

জনতা-রাষ্ট্র-পুলিশ

শহীদ ইকবাল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কিছু অঙ্গীকার থাকে। এর ভেতরে-বাইরে জনকল্যাণের নানা শর্ত নিহিত। কথাগুলোর ধারণা সেই স্টোয়িক দর্শনের সময়ের। গ্রিক সমাজের। দার্শনিক প্লেটোর। পরে অগ্রসরমানতার ভেতর দিয়েই রাষ্ট্রধারণা সম্মুখে চলেছে। কার্যত, রাষ্ট্রর তো বিকল্প নেই! ভারতবর্ষে প্রাচীনত্ব ছিল অনেককিছুর। এর সংস্কৃতি বহু পুরনো। কিন্তু রাষ্ট্র-ধারণা বা এর অবকাঠামো যেমনই হোক, জনশর্তাধীন প্রবণতায় তাকে তো নতুনই বলতে হবে। বঙ্গঅঞ্চলে রাষ্ট্র-ধারণা তো এই সেদিনের কথা। ফলে তার রাষ্ট্র বা তৎ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যে লাগসই– তা কিন্তু নয়। চর্চাটা হয়নি। বিশুদ্ধতার অঙ্কটা পরে। আমরা অনেক গল্প শুনি, অনেকেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, বৃটেনে-জর্মানে-সুইজারল্যান্ডে-প্যারিসে রাষ্ট্র অন্য ধরনের। সেখানে রাষ্ট্র জনগণের সমস্ত সুবিধাই কাঁধে তুলে নেয়। ইনস্যুরেন্স আছে। আছে শিশু ও নারীর তুমুল নিরাপত্তা। নিরাপত্তারক্ষীরা খুব সংহত ও সুশৃঙ্খল। জন্মালেই সব দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়ে নেয়। বেকার থাকতে দেয় না– কাজ দেয়, ভাতা দেয়। ওই রাষ্ট্রই সব করে। নিরাপত্তাবাহিনীই সব ব্যবস্থা করে। গল্প শুনে শুনে অনেককিছুই এখন পুরনো, বাস্তবেও এর প্রবাহ পরিচালিত হচ্ছে– নেটবিশ্বে, কতো ক্লিক– ইউরোপ-আমেরিকার সুখের বাতাস লুটায় আমাদের পায়ে। কথাগুলো মোটা দাগের হয়ে যাচ্ছে, হয়তো আপেক্ষিকও। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা কী? পঞ্চাশ বছরে তৃতীয় প্রজন্ম থেকে চতুর্থ প্রজন্ম এখন কর্মযুদ্ধে উঠে এসেছে। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এরা নানাভাবে যুক্ত হচ্ছে। তারা একটা লেগাসিও বহন করছে। তাতে রাষ্ট্র কী সুবিধেজনক কিছু করতে পারছে? বিশেষত, রাষ্ট্র-নির্ধারিত নিরাপত্তাবাহিনী বা বিশেষত পুলিশ বাহিনী। পুলিশ-জনতা সম্পর্ক, ঠিক কেমন, এখন!

কোনো কোটেশন নিয়ে কিছু প্রমাণসর্বস্ব বানানোর এখানে প্রয়োজন নেই। তাইতো নিজের ভেতরেই কিছু এলিগরিক্যাল প্রস্তাব তৈরি করি [ভাল্টার বেনজামিন (১৮৯২-১৯৪০)কথিত]। সেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের অনতিপরে থানার বড়বাবুদের দেখে চলি। খুব ভোরে ডাকাত ধরা পড়েছে, চতুর্দিকে বেশ সরব, বড়বাবু মোটা ভারী গলায় ছড়ি দুলিয়ে চৌধুরীবাড়ির লনে ডাকাতদের কীসব জেরা করছেন। ডান্ডার ভয়ে সব সপাট দশা। জনতা বিস্ময়ে সেসব দেখছে। একটা ফিউডাল সমাজের প্রকরণ ছিল সেটা। সমীহ-সম্মান-ভক্তি সমাজে অন্যরকম তখন, ক্ষমতার মৌরসীপাট্টায় ওসব থরে থরে সাজানো। বিচ্ছিন্নভাবে তখন গ্রামসমাজ ভাঙছে, বিপরীতে শহরতলীগুলো গড়ে উঠছে, প্রসারিত হচ্ছে। নাগরিক নয় কেউই। থানার বড়বাবুও নন। তাঁরা সাইকেলে চড়তেন, খুব বেশি হলে কিম্ভূত-ধরনের মোটরসাইকেল। সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার ধরনের নাম ছিল তাদের। থানার চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে পুরনো আম-জাম বা বটবৃক্ষ, শ্মশানের ন্যায় দণ্ডায়মান। তাতে জন্ম হয় মিথ। কঠোর আর ভয়ধরা একটা শাসন ছিল তখন তীব্র। হ্যাভ আর হ্যাভনট্স অর্থাৎ থানায় যারা থাকেন তারা 'হ্যাভ' আর আমজনতা 'হ্যাভনট্স'। 'সেবক'– সেবা-ধরনের প্রস্তাব, প্রজাতন্ত্রের ট্যাক্সের টাকায় পুলিশ– এসব 'অধিকার'-আলাপ তেমন তৈরি হয়নি। বোঝাও যায়নি। জানা-বোঝাটা বেশ কঠিনই ছিল। এমনই এসব স্থানিক স্মৃতির রেখার কিছু বিন্যাস। হয়তো এমনটা অনেকেরই ছিল– বেশি তফাৎ হবে না। এক এক জেনারেশন এগুলো এক একভাবে দেখবে। কারণ, সমাজটা তো স্থির নয়। সমাজ বদলালে, উৎপাদন-সম্পর্ক তৈরি হলে, শ্রেণি তৈরি হয়। সেই শ্রেণিচেতনার ভেতরেই রূপান্তরিত মন ও মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে। শিল্প-উৎপাদন বাড়লে, হাতে যখন কয়লার বদলে টুথপেস্ট বা নতুন প্রযুক্তি উঠে আসবে তখন তার অনুষঙ্গি পুঁজি ও ব্যবস্থাপনাও তৈরি হবে। থানার বড়বাবু তখন পদ বদলাবে, সাইকেলে উঠবেন না– আর এসপি সাহেবের তো বিলাসী গাড়ি হতেই পারে। কারণ, এটা ব্যবস্থার পারিপাট্য। পরিবর্তনের চাপে অর্থ-সংস্থান আর এর পরিপ্রেক্ষিতেও স্বপ্ন বদলায়। গোটা পৃথিবীই যে আজ মুঠোবন্দী। 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' [ফিওদর দস্তভস্কির উপন্যাস হলেও এর চরিত্রগুলোও সর্বদা একরকম থাকে না!] বদলেছে। এটি রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব বা চলতি দায়িত্বের ভেতরে প্রতিশ্রুত হয়ে পড়ে। ফলে নির্ধরিত কাউকে ইঙ্গিত করে তেমন ফল লাভ হয় না, বস্তুত– তাতে করে জেলাসি আর অসন্তুষ্টি বাড়ে– আর সেটি কাজের কথাও নয়। তবে বলে নিই, এসব কোনো সাফাইমন্ত্র নয়!

যদি আমাদের চলতি জীবনে কখনো মনে হয়, 'পুলিশ দিয়ে কাজ নেই'– তখন রাষ্ট্র কি ভেঙে পড়বে? বা রাষ্ট্র পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করে তাতে যদি মনে করি পুলিশ নষ্ট হয়ে গেছে– তাহলে তার ভালোত্ব কীভাবে ফিরে আসবে? রাষ্ট্র কী পুলিশ ছাড়া চলবে? প্রথম প্রশ্নে যদি ফিরে চলি, তখন কি একবারও এমনটা ভেবে শিউরে উঠি না যে, পুলিশ ছাড়া বা বাহিনী ছাড়া রাষ্ট্র অসম্ভব! এই অসম্ভবের ভেতরেও মাঝে মাঝে জনগণ পুলিশ সম্পর্কে কেন হতাশা বোধ করে! সেবার মান নেই বলে? বা 'সেবা' নামক কথাটা প্রজাতন্ত্রে শুধুই কাগুজে বলে? এখনও কী পুলিশে ভালো অফিসার নেই? সম্প্রতি শুনি, মেধাবী অনেকেই এখন পুলিশ প্রেফার করছে– এটা কী সদুদ্দেশ্যে না অসৎ প্রবণতায়? প্রশ্নগুলো গতানুগতিক। এবং অনেকেরই উত্তর জানা। তবে এর সমাধান কী? পুলিশ মানেই এখন যে 'ইমেজ' সমাজে প্রিকনসীভলি প্রতিষ্ঠিত, তা হলো সমস্ত নীতিনিষ্ঠার বিপরীতে পুলিশ যা খুশি তাই করে! যেটুকু বলা হয় তার চেয়ে বেশিই করে। কেন? এতো টোডরমলের যুগ নয়! ক্ষমতা কেন বেশি দেখাবে বা অসহিষ্ণু হবে, প্রজাতন্ত্রের সেবক না হয়ে শাসক হবে– সর্বোপরি জনগণের আস্থা পাবার বিপরীতে 'ভয়' কেন সৃষ্টি করবে? তবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রয়োজনের গোড়ার কথা কী ছিল? ব্যুরোক্রাসি কেন তৈরি হলো তাদের ক্ষমতা কেমন? পুলিশে কেন ব্যুরোক্র্যাসি ঢুকে পড়লো? ব্যুরোক্র্যাসি তো সেই পুরোন কাসুন্দিতেই আটকানো– ফলে বর্তমান ক্ষমতার মৌরসীপাট্টার ভেতরে বুরোক্র্যাসি ঢুকবে এটা তো অসম্ভব কিছু নয়! আমাদের বৃটিশ

ব্যুরোক্রাসিই তো এখনও চালু আছে। সময় বদলেছে, ব্যুরোক্র্যাসি বদলায়নি। ফলে এর যে আগ্রাসী রূপ সেটি পুলিশে ঢুকে পড়েছে। পুলিশে তা সেটও হয়ে গেছে। ফলে, সেবা ও সশ্রমতা কমে গেছে। বৃহত্তর স্বার্থটি মুখ্য হচ্ছে না। আমরা জানি, যে কোনো হেনস্থাই অপমান! অপমান আর অপমানিত বিবেক তুচ্ছ করে দিচ্ছে নাকি অনেককিছু! পেশাদারিত্ব কমে যাচ্ছে। পেশাদারিত্ব হচ্ছে নিম্নগামী– কিন্তু পুলিশ যেহেতু প্রত্যন্ত, প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করে ফলে তাকে ঘিরে ঈষা-জেলাসিও অনেক বেশি। অনেকেই নানাভাবে চার্জড হয়ে প্রতিপক্ষ করে ফেলে। প্রযুক্তির প্রবাহে মনোপোলার বিশ্বে রাজনীতি ও রাজনৈতিক শোষণ এখন বেশ জটিল। এই জটিলতা দেশে দেশে এখন নতুন সংস্কৃতি তৈরি করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফেসবুক সংস্কৃতি, ইউটিউব সংস্কৃতি, ট্র্যাকিং সংস্কৃতি ইত্যাদি। গুগল এখন সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম। সেখানে সব সহজলভ্য এবং অধিকমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সার্ভিলেন্স সেখানে তীব্র। কার্যত সে একটি রাষ্ট্রের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সমস্ত গোপন তথ্যভাণ্ডার গুগলের করায়ত্ত। রাষ্ট্রীয় পুলিশের জন্য এটি ঝুঁকি হতে পারে আবার তথ্যসঞ্চারী সহায়ক উৎসও হতে পারে। কিন্তু মানুষের পৃথিবী এখন নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। ক্রমশ মানবপ্রজাতি সংকুচিত হতে হতে কোন পর্যায়ে পৌঁছুবে– কেউ তা জানে না! তবে আশঙ্কা মানবিক পৃথিবী ক্রমশ সংকুচিত হতে চলেছে। রাষ্ট্রসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, এখন তার রূপান্তর ঘটেছে আরও অধিক প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে। তাইতো মাঝেমধ্যেই বলতে শোনা যায়– 'পুলিশি-রাষ্ট্র' কথাটা। যেখানে ধরা সহজ যে, রাষ্ট্রের পুরো প্রক্রিয়াটাই এখন সেঁধিয়ে গেছে পুঁজি-ব্যবস্থার ভেতরে। এখন রাজনীতিক কারা? পার্লামেন্টে আইন তৈরি করেন কারা? একটু আগে ব্যুরোক্র্যাসির কথা বলেছি। প্রক্রিয়াটা ভিন্ন নয়। ওই ব্যবস্থার ভেতরেই পুনর্বিন্যস্ত রূপকাঠামো তৈরি। ফলে পুলিশকে আলাদা ট্রিট করে কী হবে? পুঁজিবান এবং ব্যবসায়ীর একই স্বার্থ ও সম্পর্কও তাদের ওতপ্রোত। সরকারের অংশীদারিত্বও নিয়ে নিয়েছে তারাই। পার্লামেন্টে থাকছে তারা। দেশে দেশে বস্তুত, জনতাবিমুখ অংশটিই এখন জনতার প্রতিনিধিত্ব করে চলছে। আজকে আমেরিকার নির্বাচনেরও আমরা কতো ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করছি। গণতন্ত্র একটি চর্চিত বিষয়। চর্চার ভেতর দিয়েই তার পরিশীলন ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। সেখানে আমেরিকার মতো রাষ্ট্রে যে ট্রাম্পীয় ভ্যাম্প আমরা দেখলাম তা তো এই মনোপোলার বিশ্বেরই টাটকা সিনারিও। আফগানিস্তানে, ইরাকে, মিশরে যা ঘটেছে– তাতে এই অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা কীভাবে বিপন্ন করে তুলছে সাধারণ মানুষদের, সেটা আমরা দেখছি! রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পরে রাষ্ট্রের এই যে অবনমন এবং সে অবনমনের ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল হাঙ্গর [নতুন সাম্রাজ্যবাদী চেহারায়] মার্কিনী টপোলজিক্যাল রাজনীতিতে মানবতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অস্ত্র বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা আর কর্তৃত্বের যে লেগাসি তৈরি করেছে– তার ফল পুরো বিশ্বে প্রতিফলিত। আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকা আজ করতলগত ওই সাম্রাজ্যবাদী নখরের নিচে। সেখানে চিন বা জাপানের মতো ক্ষমতা-জায়ান্টও একইভাবে তৈরি হচ্ছে। তবে প্রযুক্তির সুবিধে যতো বাড়বে, ততোই পিছিয়ে পড়বে তৃতীয় বিশ্ব। গরিব আরও গরিব হবে। ক্ষমতা ও ভোগবাদ হাত ধরাধরি করে চলবে। পণ্য ও পর্ণোর বিস্তার ঘটবে। অসুস্থতা ও বিকার বাড়বে। মূল্যবোধের ঘটবে চরম বিনাশ। অপরাধের বহুমুখী মাত্রা বিচিত্র দিকে ছড়িয়ে পড়বে। জীবনের গাঢ় সমাচারে যুক্ত হবে তীব্রতর অসমতার সংকট ও বলা-কওয়ার সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়বে যান্ত্রিক সার্ভিলেন্স। পুঁজির এই আগ্রাসনে শাসন-বিচার-আইন অসুস্থতার ধারাকেই বেগবান করে তুলবে। ফলে রাষ্ট্রের পুলিশ– যে এই ব্যবস্থার অংশীদার সে কোথায় যাবে? কীভাবে তারা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করবে? পুলিশের সৎ ও দক্ষ অফিসাররা কতোটুকু নিজের কাজ করতে পারবেন? জনতার বিপরীতে তো পুলিশ নয়! সরকারের আভ্যন্তরে যদি পরিশোধিত বা কল্যাণকর কোনো প্রস্তাবনা তৈরি না হয়, কোনো মেধাবী ছাত্র যদি জনকল্যাণকর কাজগুলোতে তাদের স্বপ্নের অংশীদারিত্ব না করে– তবে শুধু পুলিশ বা ইনফ্যান্ট্রি কী ঠিক কিছু করতে পারবে? তাতে কি বিতর্ক আরও বাড়বে না?

মূলকথা রাষ্ট্র যদি রাজনীতিক হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে না পারে, প্রজাতন্ত্রের দায় না শেখাতে পারে– বিপরীতে ক্ষমতা আর অর্থকড়ির লালসার চোখ তৈরিতে সহায়তা করে– তবে প্রজন্ম কীভাবে মানবিক হবে বা তার প্রতি অনুসৃত দায় সম্পর্কে কীভাবে সে দায়িত্ববান হবে? ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির বহুরৈখিক চিন্তার চাষ যদি না হয় তবে আপামর বা প্রান্তিক মানুষের দায় কখনো তৈরি হয় না। প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বে প্রজাতন্ত্র কোনোরূপেই সেবকের ভূমিকায় নিজেদের নিরত রাখতে পারছে না। বরঞ্চ ক্রমাগত 'লাঠি যার ভূমি তার' ধরনের সেকেলে মেজাজের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। মেধার এ বেশুমার অপচয়ে জ্ঞানভিত্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বড় বড় মেধা এদেশ থেকে নানাভাবে পাচার হচ্ছে। প্রশাসন চালানোর জন্য, শাসন ব্যবস্থা বা আমলাব্যবস্থা চালানোর জন্য আদিষ্ট আদেশই যথেষ্ট, সেখানে মেধার জরুরিত্ব কম! কিন্তু মেধাবীরা সেদিকেই ঝুঁকছে। শুধুই ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একজন ছাত্রকে এসপি বা ডিসি হওয়ার স্বপ্নের চেয়ে বড় কোনো স্বপ্ন দেখাতে পারছে না। কেন? ব্যবস্থার ভেতরেই তার উত্তর আছে। ওয়াল্ড ব্যাংক যে পুঁজির লগ্নীকরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গলায় গামছা বেঁধেছে– সেখানে ইতিহাস পড়লেও বলতে হয়, কেন তুমি ইতিহাস পড়– তার বাজার কোথায়? প্লেটো বা সক্রেটিসের বাজার আছে কী? ফলে কেউ আর রাজনীতিক বা শিক্ষক হতে চায় না। স্ট্যান্ড করা ছাত্রটি স্বপ্ন দেখে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হওয়ার! ফলে জনকল্যাণমূলক সমাজ গড়ার ভিত্তি তৈরি হবে কোথায়! কোনো একক প্রতিষ্ঠান বা একক কোনো ব্যক্তি কী তা করতে পারে? ইতিহাস পথ চলতে তখনই সহায়তা করবে যখন বিদ্যমান বাস্তবতার ভেতর দিয়ে ব্যবস্থার নবায়ণ হবে। জীবনের ইঙ্গিতগুলো তখনই অর্থপ্রদ হবে। ঝলকে ওঠা মেধা কিংবা প্রচণ্ড সৃষ্টিশীল প্রতিভার কাজ তো তাই-ই! যা হোক, এসব প্রশ্ন এরকম পরিসরে বলার তেমন অপেক্ষা রাখে না। ফলত, অনেক ঝাঁ-চকচক জৌলুস আমরা এখন দেখছি– এ আসলে মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়! এটি প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বের পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রের এক বিরাট হন্তারক শক্তি– সে এখন সম্মুখে দণ্ডায়মান। এখন যন্ত্র মূলত আমাদের অভিশাপই। কিন্তু এই অভিশাপের ভেতর হতাশা জাগালে চলবে না– তাতে আরও পিছিয়ে পড়পর সম্ভাবনা! তাই সবকিছু গ্রহণ করেই হয়ে উঠতে হবে আশাবাদী। কারণ, মানুষের তো পরাজয় নেই! সে এগিয়ে যাবেই– বাঁচবে এবং বাঁচাবেও।

বিহাস
০৭-০৯-২০২১

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) সদস্যগণের রাজশাহী রেঞ্জ কার্যালয়ে আগমন

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের অধীনে বাংলাদেশ ও তার বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সশস্ত্র বাহিনী এবং সিভিল সার্ভিসের উচ্চ পদস্থ (যুগ্ম সচিব/ব্রিগেডিয়ার) কর্মকর্তাগণ যারা জাতীয় পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে থাকেন তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনডিসি কোর্স পরিচালনা করা হয়। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২১ এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব ও শ্রীলংকার মোট ২৯ জন কর্মকর্তা গত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয় সফর করেন। উক্ত টিমের নেতৃত্বে ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি। রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম মহোদয় কোর্সের সদস্যগণকে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর তারা প্রীতি ভোজে মিলিত হন।

বিশিষ্ট জনের পুলিশ নিয়ে ভাবনা

আমার বাবা রশিদুন নবী পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর বাবাও তাই। সেই সুবাদে দেশের পুলিশ বিভাগকে সারা জীবন অন্য রকম মূল্যায়ন করে থাকি। আমার বেড়ে উঠা শিল্পী হিসেবেতো বটেই দেশভক্তি এবং সু-শৃঙ্খল জীবনে সবটাই বাবার কাছ থেকেই পাওয়া বলে মনে করি। আর তাঁর জীবনতো নির্মিত ছিল পুলিশ হবার কারনেই। আমি তাই বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগকে স্বাগত জানাই। শুভেচ্ছা জানাই। সকল পুলিশ সদস্যকে অভিনন্দন।

রফিকুন নবী (রনবী)
তারিখ-১৮/০৯/২০২১খ্রিঃ

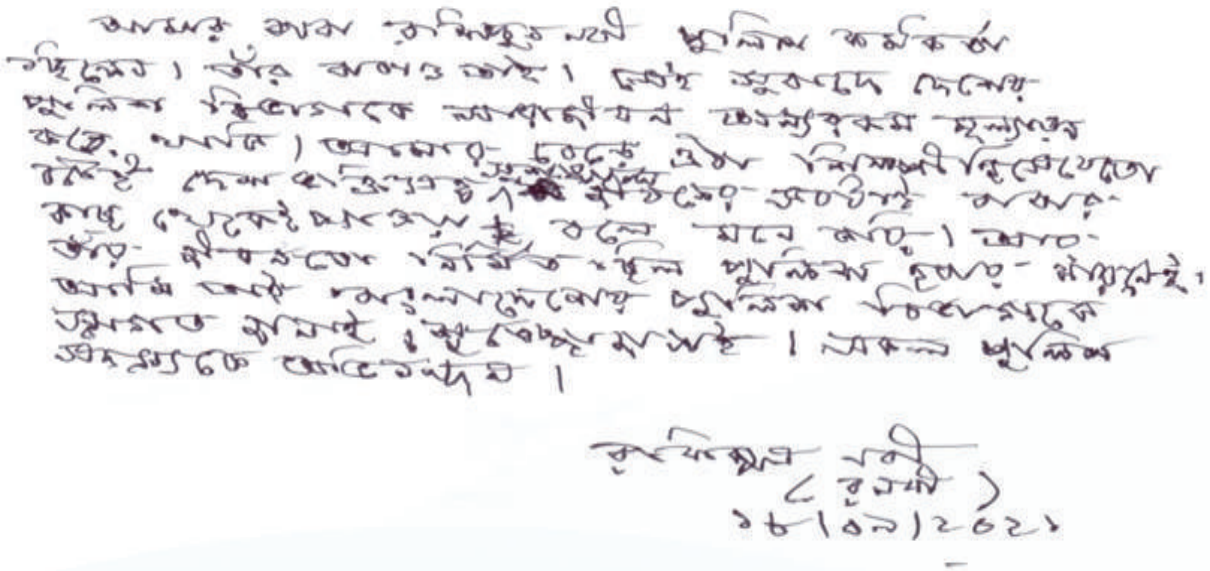

জনগনের বন্ধু

আপনাদের নিয়ে লিখার "ধৃষ্টতা" আমার নেই। আমি খুবই সামান্য একজন মানুষ। তারপরও লিখতে ইচ্ছা করে আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসার কারণে।

"বাংলাদেশ পুলিশ" নামটা শুনলেই একটা আস্থা চলে আসে। কিন্তু কিছু মানুষ এই পুলিশকে নিয়ে "যা তা বলে"

যা খুবই আসম্মানের । আবার সেই মানুষটাই যখন "বিপদে" পরে তখন সবার আগে চলে যায় পুলিশের কাছে। সেই জন্যই "সক্রেটিস" বলেছিল-" সত্যেই সেলুকাস, মানুষ বড়ই অদ্ভুত জীব"।

এইবার পৃথিবীতে যে "করোনার" আবির্ভাব হয়েছিল প্রথম ধাক্কায় তখন দেখা গেছে আমাদের পুলিশ বাহিনী কেমন ?

পার্শ্ববর্তী দেশের পুলিশ বাহিনী রাস্তায় মানুষ দেখলে পিটিয়ে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে । সেখানে আমাদের দেশের পুলিশ জনসাধারনকে বুঝিয়েছে, ভালবেসেছে। তারা "খাবার" "ঔষধ" প্রয়োজনিয় জিনিস নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌছে দিয়েছে।

করোনার সময় "মৃত" ব্যাক্তি হোক সে মা/ বাবা/ পরিবার বা পরিচিতজন, তাদের লাশ সৎকার পর্যন্ত করেনি । কিন্তু আমাদের পুলিশ বাহিনী পরম যত্নে সেইসব পরিবারের পাশে দাড়িয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক পুলিশ সদস্য মারাও গেছেন।

আমার বাড়ি মফস্বলে (সিরাজগঞ্জে)। আগে দেখতাম, সবসময় মারামারি লেগেই থাকতো । এ পাড়া ও পাড়া বা এ মহল্লা ও মহল্লা । একজন, দুজন মারাও যেত, ঘরবাড়ি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ হতো। কিন্তু এখন সেটা নাই বললেই চলে ।

আমরা এখন অনেক শান্তিতে থাকি ।

আপনাদের নিয়ে লিখা শেষ হবার নয় । তারপরও বলতে চাই, আপনাদেরকে আমাদের দরকার। আপনারা না থাকলে আমরা ভালো থাকবো না। আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ্য থাকুন। আপনারা আমাদের ভাই, পরিবার বা বন্ধু। সেই জন্যই মনে হয় সবাই বলেন- "পুলিশ জনগনের বন্ধু"

ভালো থাকুন, সবার প্রতি আবারো আমার সালাম, শ্রদ্ধা, ভালবাসা। Love you.

জাহিদ হাসান
অভিনেতা

জনগনের বন্ধু

একজন অভিনেতা হিসেবে আমাকে নানারকম চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। পর্দায় আমি কখনো গ্রামের সরল যুবক হিসেবে অভিনয় করি, আবার কখনো কাজ করি ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবেও। পুলিশ হিসেবেও অভিনয়ের সুযোগ আমার হয়েছে। সত্যি বলতে কী, পর্দায় পুলিশের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত হয়েছি। আনন্দ পেয়েছি।

পেশা হিসেবে পুলিশের চাকুরি খুবই চ্যালেঞ্জিং। আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা রোদ-বৃষ্টি-কুয়াশা উপেক্ষা করে দিন-রাত অনেক পরিশ্রম করেন। আমি জানি কত কষ্টের কাজে তাঁদের ব্যস্ত থাকতে হয়। অনেক সময় তাঁরা পরিবারকে ঠিকমতো সময় দিতে পারেন না। কিন্তু নিজের কাজটা ঠিকই মনোযোগ দিয়ে করে যান। আমাদের মতো জনবহুল দেশে নানারকম ঝক্কি-ঝামেলা পেরিয়ে তাঁরা কাজ করেন। পেশার প্রয়োজনে পুলিশ সদস্যদের ত্যাগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে চলমান করোনা মহামারীর সময় দেখেছি পুলিশ সদস্যরা মৃত্যুর পরোয়া না করে মানুষকে সচেতন করেছেন। তাদের মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও খাবারসহ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছেন। এমনকি করোনায় মৃত মানুষকে ধর্মীয় মতে সৎকার করেছেন। অথচ তাদের স্বজনরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের পুলিশ কিন্তু ভয় পায়নি। যথার্থ বন্ধুর মতো মৃত নাগরিকের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে।

আমি কেবল একজন অভিনেতা নই, আমি একজন শিল্পী। পাবনার গ্রাম থেকে একদিন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে হাজির হয়েছিলাম রাজধানী ঢাকায়। ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। বাংলাদেশ অনেক বদলে গেছে। বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। আমার খুব ভালো লাগে যখন পত্রিকা খুলে দেখি পুলিশ কোনো জটিল অপরাধের রহস্য উন্মোচন করেছে। অপরাধীকে আইনের আওতায় এনেছে। এমন সুসংবাদ একজন নাগরিক হিসেবে আমাকে আনন্দিত করে। বাংলাদেশকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পুলিশের শ্রম-মেধা ও ঘামকে আমি শ্রদ্ধা করি। সালাম জানাই।

চঞ্চল চৌধুরী
অভিনেতা ও শিল্পী